

---

# THE SHOES

---



FERDINANDO

## GILLETTE-এর মানুষ, জুতো

তফাতটা কোথায়?

দিনটা ছিল 10 নভেম্বর 1984, সকাল 9:30। বাবা আমার শোবার ঘরের দরজা খুলে আলো ঢুকতে দিলেন, তারপর বললেন, “নান্দো, দরজায় Carabinieri এসে তোর খোঁজ করছে। কী বালের কাণ্ড করেছিস তুই?”

“বাবা,” আমি বললাম, “ঠাট্টা করছ নাকি? ঘুমোতে দাও। আজ ভোরে ফিরেছি। কাল মেলানিয়া আমাকে শেষ করে দিয়েছে।”

“মেলানিয়াটা আবার কোন বাল? পাছা তোল, মুখ ধো, জামাকাপড় পর, তারপর বাইরে আয়। ওদের সঙ্গে কথা বলে জেনে নে কী চায়।” “আচ্ছা, আসছি।”

মার্শাল পোস্কা আর ডেপুটি ব্রিগেডিয়ার পাতানে আমার পরিচয়পত্র দেখে নিয়ে বললেন: “সামরিক সেবার বাধ্যবাধকতা পালন করতে 17 নভেম্বর আপনি যদি কাসের্তার ফেরারি ওরসি সাঁজোয়া বাহিনী স্কুলে হাজির না হন, তবে কাল সকালে সবার আগে সামরিক প্রসিকিউটরের দপ্তর গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করবে। আমরা এসে আপনাকে তুলে নিয়ে জেলে পুরব।”

আমি তাঁদের দিকে তাকিয়ে বললাম, “কফি খাবেন? আমি সবে ঘুম থেকে উঠেছি। এফুনি আসছি, তারপর এই সিনেমার দ্বিতীয় অর্ধেকটা শোনাবেন। আপনারা বেশ মজার লোক, বলতেই হচ্ছে।”

বাবা ইশারায় সেনাদের বোঝালেন যে আমার মাথার ঠিক নেই, আর তাঁরা থমকে গেলেন। রান্নাঘর থেকে ফিরে এসে জিজ্ঞেস করলাম, আমার কি কোনো তলবের চিঠি পাওয়ার কথা ছিল। তাঁদের কাছে ছিল আমার মায়ের সেই করা একটা রসিদ, মা সেই মুহুর্তে কাজে।

আর এক সেকেন্ডও নষ্ট না করে আমি ভুল বোঝাবুঝির জন্য ক্ষমা চাইলাম, আর কথা দিলাম যে নির্দিষ্ট দিনে আমি সেখানে থাকব, সেই পোশাক গায়ে চড়াতে তৈরি, যা বারো মাস পরে থাকতে হয়, যতদিন না দইয়ের মতো তার মেয়াদ ফুরোয়।

আমি তৈরি হলাম। যে রাতে রওনা দিলাম, বাবা হাত নেড়ে বিদায় জানালেন। আমার সামান্য কটা লিরার সঙ্গে — আজকের দশ ইউরোর সমান — কিছু যোগ করতে বললে তিনি বললেন, “টেনে

চালাস। মাসে 60,000 লিরা পাবি। ওতেই তোকে চলতে হবে।”

মা ঘুমের ভান করে রইলেন, উত্তর দিলেন না। রাত 11:45-এ আমার বন্ধু ওরেন্সে তার বাবার Fiat 850 নিয়ে আমার বাড়িতে এল — তার বাবা রেল চাকরি করতেন — আর আমাকে স্টেশনে পৌঁছে দিল। বাবা-মায়ের আচরণটা তখন আমি বুঝিনি। তাঁরা যা করলেন, আমার কাছে তা স্বাভাবিকই মনে হয়েছিল। ওটাই ছিল আমার প্রথম সত্যিকারের পাঠ।

পরদিন সকাল 6:10-এ নেপলসে পৌঁছলাম, তারপর কাসের্তার ট্রেন ধরলাম। স্টেশনে ব্যারাকের পথ জিজ্ঞেস করে নিয়ে গেট পর্যন্ত আরও তিরিশ মিনিট হাঁটলাম। ডিউটি অফিসারের কাছে হাজিরা দিলাম, তিনি বললেন, “আরেকজন দেরিতে আসা, ব্যাচ 9/84।” আমি ঢুকছিলাম এক নতুন বাড়িতে। সেখান থেকে বেরোব এক বছর পরে।

আমাকে সোজা পাঠানো হল রসদ ভাণ্ডারে। হাতে ধরিয়ে দেওয়া হল একটা পিঠের ব্যাগ, দু জোড়া যুদ্ধের বুট — একটা নিচু, একটা উঁচু — একটা বেল্ট, পশমের মোজা, খাবারের দুটো টিনের পাত্র, একটা কাপ, একটা জলের বোতল, ওষুধ রাখার একটা ইস্পাতের বাস্ক, স্নিকার্স, ক্যামোফ্লাজ পোশাক, একটা টুপি, একটা আনুষ্ঠানিক উর্দি, ব্যারাকে পরার একটা ফেজ, সোজা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে উঠে আসা দু জোড়া বক্সার শর্টস, আর পশমের দুটো লম্বা-হাতা গেঞ্জি। আমি হাসলাম, তখনও বুঝিনি ওই গেঞ্জিগুলো কতখানি আমার প্রাণ বাঁচাবে।

মনে হচ্ছিল সিনেমার ভেতরে আছি। শিস দিতে দিতে বেরিয়ে এলাম, আর উল্টো দিক থেকে আসা এক অফিসার আমাকে থামিয়ে দু দিনের শাস্তি দিলেন, তাঁকে স্যালুট না করার জন্য। নিয়তি ঠিক করল, আটচল্লিশ ঘণ্টা আমি আমার বাস্কে বন্দি থাকব, কারও মুখ না দেখে।

পরপর দু সকাল আমার ভাগে পড়ল শৌচাগারের ডিউটি: 280 জন পুরুষ হেগে যাওয়ার পর পায়খানা সাফ করা — আর সবাই যে ভেতরে ফেলতে পেরেছিল, তা-ও নয়। আমার ঘেন্না করেনি। ওটাও ছিল সামরিক সেবা। আমাকে দেখে শিখতে হয়েছিল যে সবাই এক রঙের গু হাগে না, আর সেটা শুধু খাবারের কারণে নয়।

এক সপ্তাহ পরে আমার শহরের কাছাকাছি এলাকার এক সহ-সৈনিক আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। তার নাম ফ্রান্সো নিকোলো, ব্যাচ 5/84। অসামরিক জীবনে সে ছিল বিশ্ববিখ্যাত এক জুতোর ব্র্যান্ডের বিক্রয় প্রতিনিধি। আমাকে তার মনে ধরল। চল্লিশ দিন পরে সে আমার জন্য আটচল্লিশ ঘণ্টার একটা ছুটি জোগাড় করে ফেলল, আর আমরা তার গাড়িতে একসঙ্গে উড়ে চললাম বাড়ির দিকে। রাস্তায় আট ঘণ্টা, কিন্তু পুষিয়ে গিয়েছিল।

বাড়িতে মা জিজ্ঞেস করলেন, আমি পালিয়ে এসেছি কি না। তিনি ভেবেছিলেন আরও অনেক বেশি দিন আমি তাঁর ঘাড় থেকে নেমে থাকব। রবিবার মাঝরাতে ফ্রান্সে আমাকে তুলে নিল, আর আমরা ফেরার পথ ধরলাম।

গাড়িতে উঠতেই সে বলল, পাঁচ লিটারের একটা মদের জার দু পায়ের ফাঁকে ধরে রাখতে। ওটা তার মার্শালের জন্য — তাঁর সুনজরে থাকার একটা উপায়। তবে ব্যারাকে পৌঁছতে পৌঁছতে আমরা মাতাল। তক্ষুনি দু দিনের জন্য অসুস্থ বলে নাম লেখলাম।

তারপর এক অফিসার সবার সামনে ফ্রান্সকে হুমকি দিলেন। ফ্রান্সে জবাব দিল, “ব্যারাকের বাইরে পা দেওয়ামাত্র আপনাকে গুলি করব।” অফিসার তাকে গ্রেপ্তার করিয়ে সামরিক আদালতে তুললেন। সামরিক জেলে তার ষাট দিন হল।

ওখানে তাকে আর কখনও দেখিনি, কারণ আমাকে অন্য জায়গায় বদলি করা হয়েছিল। কিন্তু সেই সময়টা ফুরোলে আমরা প্রায়ই কাজের জায়গার কাছে দেখা করতাম আর একসঙ্গে খেতাম, মার্শালের মদের কথা মনে করে।

সে সেলফ-সার্ভিস জুতোর দোকান খুলেছিল, আর ব্যবসা ভালোই চলছিল। যখনই কিছু কিনতে টু মারতাম, রাজকীয় খাতির পেতাম — ছাড়ের ওপর ছাড়। কিন্তু একমাত্র আমিই জানতাম যে সে আমার চেয়ে ভালো বিক্রেতা। আমি কখনও একটা কথাও বলিনি। আমি তখনই Gillette-এর মানুষ।

#### রংরুট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

প্রশিক্ষণ শুরু হল: একটা রাইফেল খুলে ফেলা আর আবার জোড়া, তারপর আরেকটা, তারপর একটা পিস্তল। সেগুলো পরীক্ষার করা। মার্চ, দৌড়, বিরতি, খাবার ঘর, ব্যারাকের জরুরি কাজকর্ম, সাধারণ সৈনিকদের মেস, নন-কমিশন্ড অফিসারদের মেস, আর অফিসারদের মেস।

বড়দিন, রাত নটা, হাড়-কাঁপানো ঠান্ডা। ওই পশমের গেঞ্জিগুলোই প্রাণ বাঁচিয়েছিল, বিশেষ করে যখন আমাদের প্রথম পাহারার ডিউটি শুরু হল। তারপর পুরস্কার হিসেবে আমাদের দেওয়া হল পনেরো দিনের বারুদঘর পাহারা। গা ধোয়া ছিল মরীচিকা। জাঙ্গিয়ার ভেতরে তখন আর পরজীবী আর ময়লার তফাত করা যেত না, তিল আর উকুনেরও না।

তাপমাত্রা ছিল পাগল-করা: মাইনাস তিরিশ। মোতা ছিল অসম্ভব — জমে যেত, আর তুমি ঘুরে বেড়াতে ধোনের সঙ্গে লেগে থাকা পেছাপের এক স্ট্যালাকটাইট নিয়ে। হাহাহাহা।

আর ঘুমিয়ে পড়ার কথা ভাবলেও শাস্তি আর জেলের ঝুঁকি ছিল। কোথায় যেতে হবে, সমস্যা সেটা ছিল না: আমরা তো ওখানেই পাহারায় দাঁড়িয়ে, বন্দি আর গোলাবারুদের কারখানার মাঝখানে।

এক ছুটির সন্ধ্যায় আমি অফিসারদের মেস থেকে খানিকটা দূরে ছিলাম। দেখছিলাম সুন্দরী, সুগন্ধি-মাখা নারীরা নাচের আসরে আসছে তাদের অফিসারদের সঙ্গে, যাদের গা থেকে ঠিকরে পড়ছে মোহ আর ক্ষমতা। আর আমি বুঝতে শুরু করলাম বাইশ বছর বয়সে আমার বাবাকে কী কঠিন অবস্থার মুখে পড়তে হয়েছিল, সাঁজোয়া অশ্বারোহী বাহিনীর ক্যাপ্টেন হিসেবে সেনাবাহিনী ছাড়ার পর। ট্যাঙ্ক। ঠিক সেই জিনিস, যা আমার চালানোর কথা ছিল, শুধু আমি ওর ভেতরে আঁটতাম না।

কিন্তু এক বিকেলে আমার কোম্পানি কমান্ডার আমাকে ডেকে পাঠালেন বাইরের একটা কাজের জন্য। এক মহিলাকে গাড়িতে নেপলস পর্যন্ত সঙ্গ দিতে হবে। কেউ বলেনি তিনি কে। পরে জেনেছিলাম: তিনি ব্যারাকের কমান্ডার জেনারেলের মেয়ে।

বাছাইটা পড়েছিল আমার ওপর, আর কেন, তা কেউ বলতে পারেনি। আমি সৈনিক; এগুলো ছিল সরকারি মিশন, বাড়তি টাকা মিলত। কিন্তু টাকাটাই পুরো গল্প ছিল না।

তার নাম কার্লা। আর্টট্রিশ, কখনও বিয়ে হয়নি, কখনও বাগ্‌দানও নয়। সুন্দরী বললে কিছুই বলা হয় না — উসকানি-ভরা আর দুষ্ট, কম করে বললেও।

ওটাই ছিল আমার প্রথম ধো-ন্য কাজ, আর মোটেও মন্দ হয়নি। শুনেছিলাম সে আবার আমার খোঁজ করেছিল, কিন্তু ততদিনে আমাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে সেনাবাহিনীর ব্রীড়াবিদদের কোম্পানিতে। আমি রাগবি খেলতাম, আর পরে সামরিক জাতীয় দলে জায়গা পেয়েছিলাম।

### জুতো

জুতো এমন জিনিস, যা নিয়ে আমরা কমই গুরুত্ব দিয়ে ভাবি, অথচ শরীর আর মনের জন্য তার গুরুত্ব বিপুল। সে আমলে আরও বেশি জরুরি ছিল যে জুতো চামড়ার হবে — একমাত্র উপাদান, যা পা শুকনো রাখত আর গোটা শরীরটাকে সচল রাখত।

আমি কখনও বেশি জুতো ক্ষয় করিনি। আমার জুতো ছিল খুবই কম, আর যা ছিল তা সব সময় সারিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছি। আমার কাছে দাম ছিল কাজের, চেহারার নয়। যে কোনো জুতো পরে যার খুশি পাহায় লাগি মারা যায়, আর তাতে ডিজাইনারের লেবেল আছে কি না, কেউ দেখে না।

আজ আমার স্ত্রী একটা সেলফ-সার্ভিস জুতোর দোকানে থামতে বলে। মনে পড়ে, দোকানটা একসময় ছিল ফ্রান্সের, আমার সহ-সৈনিকের, আর আমরা ভেতরে ঢুকি।

চল্লিশ বছর কেটে গেছে। এখনও একই রকম — একই বিন্যাস। স্ত্রী জুতো বাহতে বাহতে বাস্কেটগুলো আমার হাতে ধরিয়ে দেয়, তারপর পরে দেখতে বেঞ্চের দিকে যায়।

এর মধ্যে এক মহিলা জিজ্ঞেস করেন মেয়েদের বিভাগটা কোথায়, আর আমি পথ দেখিয়ে দিই। এক ভদ্রলোক জানতে চান একটা বিশেষ জুতো 41 মাপে আছে কি না, আর আমি বলি ওই মাপ শেষ হয়ে গেছে। জুতো পরে দেখছেন এমন দুই মহিলা আমার মত চান, আর আমি বলি ওই জোড়াগুলোয় তাঁদের অপূর্ব লাগছে।

আমার স্ত্রী কিছুই টের পায় না। কুড়ি মিনিট ধরে, নিজেও না বুঝে, আমি দোকানের কর্মচারী হয়ে গেছি। সবাই আমার কাছে আসে। পুরুষদের জবাব দিই ঠান্ডা গলায়, যাচ্ছেতাইভাবে, আর মহিলারা তাঁদের পছন্দের জন্য পান আমার সবটুকু মুগ্ধতা।

ক্যাশ কাউন্টার ভরে ওঠে, প্রায় ভেঙে পড়ার জোগাড়। মালিক ধরতে পারে না কী ঘটছে। আমরা জুতোর দাম মিটিয়ে বেরোতে যাই, কিন্তু তার আগে জিজ্ঞেস করি সে ফ্রান্সকে চেনে কি না। “হ্যাঁ,” সে বলে, “উনি আমার বাবা।” “তবে ওঁকে আমার শুভেচ্ছা জানিয়ে।”

বেরোনোর সময় মহিলারা আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে হাত নাড়েন। আমার স্ত্রী তখনও কিছুই টের পায় না।

সমস্যাটা আসে প্রায় দু ঘণ্টা পরে, যখন আমার মেয়ে আবার জুতোর দোকানে যেতে চায়। সেখানে মালিকের ছেলে আমাকে এক পাশে ডেকে নিয়ে বলে, “মিস্টার ফ্রেগা, ক্যাশ কাউন্টারে আমি কিছু বলিনি। চাইনি খদ্দেররা শুনে একটা হইচই বাধাক। 2021 সালে বাবার একটা ভয়ংকর দুর্ঘটনা হয়েছিল, আর 2023-এ উনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন।”

আমার সত্যিই খুব কষ্ট হয়। তার ছেলেকে আমি তার বাবার সঙ্গে আমার কাটানো দিনের একটা গল্প বলি, আর সে চোখে জল নিয়ে আমাকে শব্দ করে জড়িয়ে ধরে।

আমার মেয়ে তার জুতো কেনে, দাম দেয়, আর আমরা বেরিয়ে আসি। বিদায় জানাতে জানাতে ছেলেটি হেঁকে বলে, “দেখা করতে আসবেন। আপনার মতো বিক্রেতা আমার দরকার, যারা বিনা পয়সায় কাজ করে।” আর আমি বলি, “তুমি আমার বইগুলো ডাউনলোড করোনি, তাই না?”

সে হাসে। আর জীবন চলতে থাকে।

---

ফেরদিনান্দো